ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
ঊনচত্বারিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৬/জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়ন: প্রতিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত

(Development of Ecopark in Bangladesh: An Ecological Perspective)

এ.এস.এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

Abstract: *The concept of ecopark is of recent origin. The aim of establishing ecopark is twofold: firstly, providing a recreational opportunity is for the visitors and secondly, fostering importance of biodiversity and an overall awareness about the mother-earth. In Bangladesh most of the creation of ecopark is a blatant threat on livelihood of the tribal people. For ages, tribal people have been living and working forests and they have been drawing their sustenance from the environment. But the prevailing practice of establishment of ecopark by the government has failed to take care of the symbiotic lifestyle of the tribal people living in their forest areas. In many of the case, ecoparks have been established at the cost of the up rooting tribal people living in the areas. In such cases, often, the tribal have actually no curable alternative bratras to makes a new settlement and they have nowhere else to go outside their original habitat. In most of the cases the ecopark authority is ignoring the opinion and participation of the local people. This has created conflicts between local people and park authority. Our study also explores how ecopark projects exploited the ecological integrity of park-area. The study also endeavours to suggest some suggestions to overcome the existing problems and to develop an eco-friendly strategy for establishing eco-park which would help to preserve natural biodiversity, as well as can enrich natural regeneration with the wellbeing of local people.*

১.০ ভূমিকা

পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে মেলবন্ধন। কিন্তু বিজ্ঞান ও উন্নয়ন ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নানান প্রান্তে যে পরিবেশ-ধ্বসংযজ্ঞ হচ্ছে তা এই মেলবন্ধনে ছেদ ঘটাচ্ছে। এই ছেদের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পরিবেশ-সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। এই ভাবনার মধ্যে আমরা যখন দেখতে পাই আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক অপতৎপরতা, ব্যবসায়িক মনোবাঞ্ছা, কিংবা বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর উপর দলন পরিচলনের মতলব তখনই পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এ পর্যন্ত যে কয়টি ইকোপার্ক গড়ে উঠেছে তার ভৌগোলিক অবস্থান, স্থান নির্বাচন এবং সাংস্কৃতিক দলনের তথ্যাদি অনেক প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। এ পর্যন্ত আমরা যে কয়টি ইকোপার্ক প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার সিংহভাগই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। সবকয়টি ইকোপার্কের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অরণ্য-সংস্কৃতি নির্ভর জাতিগোষ্ঠী। লক্ষ করা যাক: ক. মধুপুরে : গারো ও কোচ নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, খ. গজনী : কোচ ও মান্দি নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, গ. মধুটিলায় : মান্দি, কোচ ও হাজং নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, ঘ. মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়ায়: খাসিয়া ও মান্দি নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, ঙ. চিম্বুক পাহাড় এলাকায়: ম্রো, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগা এবং চাকমা নৃগোষ্ঠী জনগণের বসবাস, চ. আলুটিলায়: ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

জনগণের বসবাস। ইকোপার্ক প্রকল্পের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নির্বাচন করা হচ্ছে। তাহলে কি ইকোপার্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে 'সামাজিক সংস্কৃতির অধিগ্রহণ মনোবৃত্তি'? যে মনোবৃত্তির উৎসে রয়েছে ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনা ও তার দার্শনিক শিক্ষা। এ শিক্ষার উপর ভর করেই আমরা পাহাড়ের অধিবাসীকে বলছি উপজাতি (?) । এ নামকরণের মধ্যেই রয়েছে দাপুটে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ক্ষুদ্র-জনগোষ্ঠীর অসহায় বাস্তবতা। একদিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবোধ, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ ভক্তি ও সংরক্ষণবাদী মনোবৃত্তি, অন্যদিকে আধিপত্যবাদী স্বরূপ-এই দুটি সাংস্কৃতিক উপাদানের উৎপাতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হয়ে উঠছে 'ভূলুণ্ঠিত সাংস্কৃতিক সত্তা' অন্যদিকে বৃহৎজনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হয়ে উঠছে 'আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক বলয়' । স্বরূপের দিক থেকে দুটি আলাদা, স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন নিজেকে পরিণত করছে 'দলনকারী' হিসাবে, অন্যজন 'দলিত' হিসাবে। আর এই দ্বৈতবাদী চরিত্রের প্রকাশিত রূপই হলো উন্নয়ন, সেটা হোক 'ইকোপার্ক উন্নয়ন' বা অন্যকোনো উন্নয়ন। প্রবন্ধে ইকোপার্ক উন্নয়নের এ দিকটি আলোকপাত করার পাশাপাশি ইকোপার্কের ভৌগোলিক অবস্থান, ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সংঘটিত প্রতিবেশবাদী সংকটের একটি স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইকোপার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এসব এলাকায় পরিবেশ-বৈরী কর্মকাণ্ডকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইকোপার্ক উন্নয়ন পর্যবসিত হয়েছে তথাকথিত কর্মকাণ্ডে। যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সারাপৃথিবী জুড়ে ইকোপার্ক উন্নয়ন হয়েছে- তার মর্মকথা হল "বিশেষ অঞ্চলে জন্মানো ও বসবাসরত উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের" মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুধাবনের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি সহনশীল হওয়া। এই সহনশীলতা একদিকে যেমন প্রকৃতিকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করবে, অন্যদিকে নান্দনিক বোধ-বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে পরিশীলিত মানব সম্প্রদায় সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইকোপার্ক উন্নয়ন বা ইকো-ট্যুরিজম ইতিবাচক। কিন্তু বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আদিবাসী এলাকায় যে রক্তপাত হয়েছে, আধিপত্যের মহড়া হয়েছে তাতে কী ইকোট্যুরিজমের মূল লক্ষ্যকে ব্যহত করা হয় নি? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করাই আমাদের গবেষণার লক্ষ্য।

এ গবেষণা কর্মটি আমাদের 'প্রতিবেশবাদী' ভাবনার ক্ষেত্রে সমন্বিত ন্যারেটিভ তৈরি করতে সহায়ক হতে পারে। সমন্বিত ন্যারেটিভ দুটি বিপরীতমুখী ন্যারেটিভ প্রাণময়-প্রাণহীন এবং মানুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান দ্বৈততার একটি ইতিবাচক সমাধান দাঁড় করাতে সক্ষম হবে। তাছাড়া এধরনের সমন্বিত ন্যারেটিভ আচরণের মধ্যে যৌক্তিক বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম। এই সমন্বিত মনোভাব আধিপত্য বিস্তারকারী মনোভাবের বিপরীত এবং এর মধ্যে রয়েছে সৌহার্দপূর্ণ উদার মনোভাব যা সামাজিক সঙ্কট এবং পরিবেশগত সঙ্কট নিরসনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। প্রকৃতির প্রতি মানুষের মমত্ববোধ এবং উভয়ের মধ্যে গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে । ন্যারেটিভের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা পরিবেশ সম্বন্ধে তথা সমাজস্থ অবহেলিত মানুষ (নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) সম্পর্কে সমতাবাদী (egalitarian)

দৃষ্টিভঙ্গি ধারণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সুতরাং এই গবেষণা কর্মটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে যে, সামাজের সদস্যদের প্রতি এবং পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়বোধকে নৈতিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত করতে হবে।

১.৩ অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি (Empirical Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির অংশ হিসাবে ইকোপার্ক উন্নয়নের জন্য গৃহীত এলাকা সরেজমিনে তদারক করা হয়েছে। ফলে সেখানকার পরিবেশের উপর বিদ্যমান সংকটের একটি চিত্র প্রতিবেদন দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি এই উন্নয়ন প্রজেক্টের অধীনে গৃহীত কর্মসূচি এবং পরিবেশ-সংকট, আদিবাসীর প্রাত্যহিক জীবনে এবং পরিবেশ সংকটের প্রভাবে তাদের প্রান্তিক হবার ঘটনার প্রত্যক্ষ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উপাত্তের ভিত্তিতে ইকোপার্ক উন্নয়ন কিভাবে প্রতিবেশবাদী ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটি ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিজ্ঞাতমূলক বর্ণনার পাশাপাশি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে একটি মূল্যায়নমূলক অভীক্ষা (Evaluative Exposition) পরিচালনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পটি মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য/উপাত্তের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা বিভিন্ন ইকোপার্ক প্রকল্পসমূহ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি।

২.০ বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়ন : তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত

২.১. স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে ইকোপার্ক কী ? আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করেছে, কিন্তু মানব জীবন এবং তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতকে করে তুলেছে জটিল ও যান্ত্রিক। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার আবার মানুষের প্রতিপক্ষ হয়েও কাজ করছে। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনবার কৌশল অর্জন প্রাকৃতিক সম্পদকে দ্রুত নিঃশেষ করতে সাহায্য করছে। রাসায়নিক পদার্থের অবাধ ব্যবহার আমাদের পরিবেশ-প্রকৃতিকে বিষিয়ে তোলার পাশাপাশি মানব-স্বাস্থ্যকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। এসব সংকটের বাস্তবতা থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রচেষ্টা হিসাবেই মানুষের মধ্যে পরিবেশ-সংবেদনশীলতা তৈরী হচ্ছে। মানুষ এখন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আকুতি করছে " ফিরিয়ে দাও অরণ্য, লহ হে নগর"। এই আকুতিই অভিব্যক্ত হচ্ছে পরিবেশবাদী আন্দোলনে। জাতি, রাষ্ট্র, একাডেমিক জগতে সর্বত্র এখন এ সংশ্লিষ্ট আলোচনা।[৫] এরই অংশ হিসাবে ইকোপার্ক একটি পরিবেশবাদী-প্রপঞ্চ হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। ইকোপার্কের সাধারণ ধারণাটি এ প্রসঙ্গে লক্ষ করা যেতে পারে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতি, তার বিভিন্ন উপাদান উদ্ভিদ, প্রাণী এবং ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানোই ইকোপার্ক ধারণাটির লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশেষ কোনো বনাঞ্চলকে পরিবেশ-বিনোদনের উপযোগী করে তোলাই ইকোপার্ক। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বনাঞ্চল সুরক্ষা, বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণের প্রতি সচেতন হওয়া, পরিবেশ উপযোগী বনায়ন ত্বরান্বিত করাই ইকোপার্কের আরো কতোগুলো সহযোগী লক্ষ্য। স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠা বনভূমিকে মানুষের ভ্রমণ উপযোগী করে তোলা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার মধ্যে পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলাই হলো ইকোপার্কের অন্যতম লক্ষ্য।

২.২ ইকোপার্ক এবং ইকোট্যুরিজম : ইকোপার্কের প্রথম লক্ষ্যটি মানুষের সঙ্গে পরিবেশের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটানো, আর দ্বিতীয় লক্ষ্যটি পরিবেশসম্মত ভ্রমণকে উৎসাহিত করা। ১৯৯৭ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিবেশ মন্ত্রীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ইকোট্যুরিজমকে উৎসাহিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ট্যুরিজম সম্পর্কে কতোগুলো সাধারণ নীতি গৃহীত হয়[২]। গৃহীত নীতিসমূহ হলো :

১. ট্যুরিজমকে অবশ্যই পরিবেশগতভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ধারণযোগ্য উন্নয়নের (sustainable development) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই জীব-বৈচিত্র্যের নিয়ম অনুসরণ করে এর লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

২. প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় ট্যুরিজম-কর্মকাণ্ডকে সহায়ক ভূমিকায় রাখতে হবে। পাশাপাশি ট্যুরিজম শিল্প থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে লাভবান হতে হবে।

৩. ট্যুরিজম-কর্মকাণ্ডকে অবশ্যই প্রতিবেশতন্ত্রের (ecosystem) ঐক্য এবং বসবাসরত প্রাণী ও উদ্ভিদকূলের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। যেসব এলাকায় ট্যুরিজমের কারণে পরিবেশ-প্রকৃতির উপর চাপ সৃষ্টি হয় সেসব এলাকাকে ট্যুরিজমের আওতার বাইরে রাখতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান ট্যুরিজম কর্মকাণ্ডকে আধুনিকায়ন, সংস্কার করতে হবে।

৪. ট্যুরিজমের কারণে সংঘটিত পরিবেশ-প্রকৃতি এবং জীব-বৈচিত্র্যের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসমান রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তা পরিমাপ করার জন্য EIA (environmental impact assessment) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. ট্যুরিজমের বিকাশে ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে অবশ্যই পানি, শক্তি সংরক্ষণে রক্ষণশীল হতে হবে। দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা, রিসাইক্লিং প্রক্রিয়া, এবং বর্জ্য নিঃসরণ-প্রক্রিয়া পরিবেশসম্মত হতে হবে।

৬. সকল স্টেকহোল্ডার যেমন : সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহকে ধারণযোগ্য ট্যুরিজমের জন্য ভূমিকা রাখতে হবে।

৭. ট্যুরিজমকে ধারণযোগ্য করার জন্যই এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষ কর্মিবাহিনী গড়ে তোলা উচিত।

ক = ট্যুরিজম (পরিবেশবাদী শর্তসহ), ▶—◀ খ = ট্যুরিজমের জন্য পরিবেশসম্মত স্থান ▶ ইকোপার্ক

▼

গ= (ক+খ) ▶ ইকোট্যুরিজম

ডায়াগ্রাম ১ : ইকোট্যুরিজমের সাংগঠনিক কাঠামো

বার্লিন ঘোষণার উপর্যুক্ত নীতিমালাসমূহ সাধারণভাবে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছে তা একান্তই পরিবেশ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এ দিক থেকে ট্যুরিজম ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশবাদী আলোচনাকে সামনে নিয়ে এসেছে। পরিবেশবাদী এ ধারাটিই ইকোপার্কের ধারণাকে নতুন আঙ্গিক দিতে সমর্থ হয়েছে।

ট্যুরিজম বিনোদনের একটি প্রাচীন মাধ্যম। কিন্তু সমকালীন পরিবেশ সংকটের পরিপ্রেক্ষিত ট্যুরিজমকে নতুনভাবে বিন্যাস করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এই বিন্যাসের কয়েকটি শর্ত জোড়ালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধারণযোগ্য উন্নয়নের নীতিকে (principle of sustainable development) অনুসরণ করা, এই উন্নয়ন পরিবেশসম্মত কি-না তা নির্ধারণের জন্য উন্নয়নের দুটি কৌশল : স্ট্র্যাট্রেজিক এনভায়রনমেন্টাল এসেসমেন্ট এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপেক্ট এসেসমেন্ট বিধিবদ্ধভাবে অনুসরণ করা অবশ্যক। সর্বোপরি বলা যায় ট্যুরিজমের পরিবেশসম্মত ধারাটিই ইকোট্যুরিজম, আর ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে ইকোপার্কের ধারণা অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত। নিম্নের চিত্রটি লক্ষ্য করা যাক। এখানে 'ক' বৃত্তটি দ্বারা ট্যুরিজমকে, 'খ' বৃত্তটি দ্বারা ট্যুরিজমের জন্য পরিবেশসম্মত স্থান ইকোপার্ককে, সর্বোপরি 'গ' বৃত্তটি ইকোট্যুরিজমকে নির্দেশ করছে। উপর্যুক্ত তিনটি ধারণা পরস্পর অভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট। তাহলে ইকোপার্ক ইকোট্যুরিজমেরই অংশ । এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতাকে নিচের ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে:

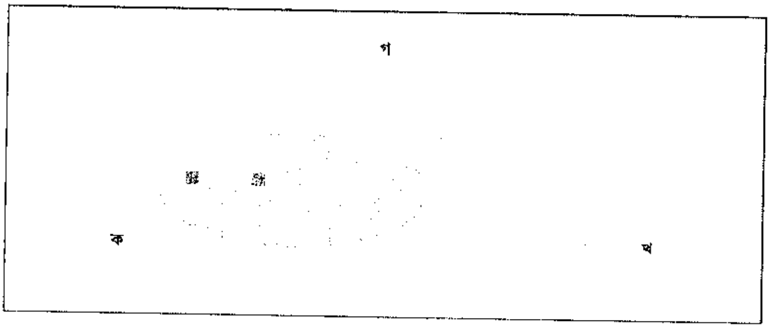

ডায়াগ্রাম ২ : ইকোট্যুরিজম, ইকোপার্ক এবং পরিবেশ পারস্পরিক সম্পর্ক

পরিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিতের কারণেই ট্যুরিজমের সঙ্গে পরিবেশ প্রত্যয়টি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। পরিবেশসম্মত ভ্রমণকে কয়েকটি দিক থেকে দেখানো যেতে পারে:

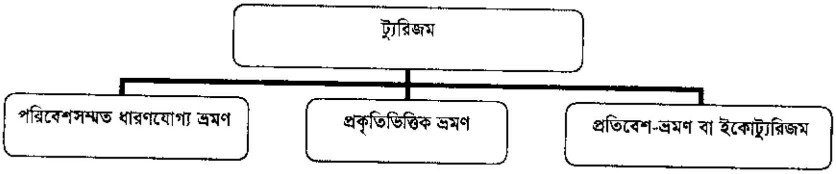

ডায়াগ্রাম ৩ : ট্যুরিজমের ধরন-প্রকৃতি

পরিবেশসম্মত ধারণযোগ্য ভ্রমণ (environmentally sustainable tourism) ধারণযোগ্য উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ধারণযোগ্য উন্নয়ন হলো প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার শর্তটি

চিন্তায় রেখে বর্তমান প্রয়োজন এবং ভবিষ্যত প্রয়োজন সাপেক্ষে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। এই উন্নয়নে ১. পরিবেশসম্মত শর্তসমূহ মেনে নেওয়া হয়, ২. কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি যেন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর না হয় সে দিক লক্ষ রেখে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং ৩. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমনসব বিকল্প নিয়ে চিন্তা করাই ধারণযোগ্য উন্নয়নের মূলকথা। উন্নয়নের এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ট্যুরিজমের যে বিকাশ হয়েছে তা-ই ধারণমূলক ট্যুরিজম (sustainable tourism)।

প্রচলিত ধারার ট্যুরিজম প্রায়ক্ষেত্রেই পরিবেশ-বিরোধী হয়ে থাকে। এমন কি অনেক সময়ই দার্শনিক বোধ-বিবেচনা বাদ দিয়েই ট্যুরিজম সম্পর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আর ট্যুরিজম বলতে যদি আমরা অনন্দদায়ক বিনোদনকে বুঝি তাহলে তা সংকীর্ণ সংজ্ঞা হয়ে যাবে। ট্যুরিজমের সংজ্ঞায় Przeclawski বলেন, জীবনের ঐচ্ছিক গতিময়তা যা অল্পসময়ের জন্য স্ব-গৃহ ত্যাগ করে প্রাকৃতিক-পরিবেশে ভ্রমণ করাকে বুঝায়।[৩] ট্যুরিজমের এই সংজ্ঞায় বিশেষ কোনো প্রেষণাকে না বুঝিয়ে বরং জনসাধারণের ক্ষণিক সময়ের স্থান পরিবর্তনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমের এই ধারণাটি ইকোট্যুরিজমের মূল-ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইকোট্যুরিজমেরও বিভিন্ন সংজ্ঞা বা শ্রেণীকরণ রয়েছে। অনেকসময় ইকোট্যুরিজম বলতে দায়সারাগোছের স্থান দর্শনকে বুঝানো হয়ে থাকে।[৪] ইকোট্যুরিজমের এ সংজ্ঞায় একজন ভ্রমণকারীর পরিবেশের প্রতি কোনো দায়বোধ শেখানো হয় না, এমনকি পরিবেশগত প্রভাব, অংশগ্রহণকারী ট্যুরিস্টদের (ভ্রমণকারীর) মূল্য এবং প্রেষণা নিয়েও কিছু শেখানো হয় না। নৈতিক বা দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যতীত ট্যুরিজমকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। Przeclawski প্রথম ট্যুরিজমকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীতিতত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি এ বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন 'Deontology of Tourism' শব্দগুচ্ছ দ্বারা।[৫] আরেকজন পরিবেশবাদী তাত্ত্বিক:নেলসন 'ইকোট্যুরিজম' ধারণাটিকে বুঝাতে গিয়ে কতোগুলো নীতি ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন যা এর মধ্যে অন্তর্নিহীত থাকে। নিচের তালিকাটি দেখা যাক[৬]:

ইকোট্যুরিজম ▶ **পরিবেশগত নীতি**
পরিবেশ নৈতিকতা
পরিবেশগত সচেতনতা

ইকোট্যুরিজমের নীতিমালা▶

১. প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিসাধন না করা।

২.পরতঃমূল্য অপেক্ষা স্বতঃমূল্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. মানবকেন্দ্রিক অপেক্ষা প্রাণকেন্দ্রিক হতে হবে। আর ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা পরিবেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের লাভটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। অন্য কোনো সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা এখানে গুরুত্ব পাবে না।

৫. ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক-পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হবে।

৬. ইকোট্যুরিজমকে অবশ্যই প্রাকৃতিক-পরিবেশসম্মত হতে হবে।

৭. ইকোট্যুরিজমের দুটি বাস্তবতার দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে: জ্ঞানগত (তথ্যমূলক) এবং ফলদায়ক (আবেগমূলক)।

সারণি ১ : ইকোট্যুরিজমের নীতিমালা

ভ্রমণ বা বিনোদনকে পরিবেশসম্মত করার তাগিদ থেকে ইকোট্যুরিজম । আর কোনো এলাকার পরিবেশ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, পরিবেশ সম্পর্কিত বোধ-উপলব্ধি বৃদ্ধি করা এবং বিনোদনের মধ্য দিয়ে পরিবেশসম্মত-চেতনা শাণিত করাই ইকোট্যুরিজমের লক্ষ্য। তাহলে আমরা বলতে পারি ট্যুরিজমের সমকালীন স্বরূপটি পরিবেশবাদী শর্তের উপর অনিবার্যভাবে নির্ভরশীল। এই শর্তটির উপর ভিত্তি করে ইকোপার্ক ধারণাটি আমদানি করা হয়েছে। সমকালীন ইকোপার্ক ধারণাটির সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে তিনটি শর্ত : ধারণযোগ্যতা (sustainability), প্রকৃতি নির্ভরতা (nature-based) এবং পরিবেশ-কেন্দ্রিকতা (ecocentric)। উন্নয়নের দিক থেকে ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে ইকোপার্কের কতোগুলো সাধারণ শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। এই শর্তসমূহের সাধারণ ছেদকে নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো হলো:

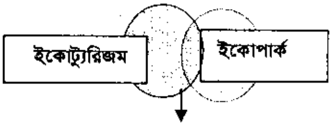

• প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ • ঐ এলাকার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত • প্রাণীবৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা • লোকায়ত জ্ঞান এবং সংস্কৃতিকে জ্ঞান-প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা • পরিবেশ-শিক্ষা, পরিবেশ-নীতিবিদ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সম্পৃক্ত করা • সর্বোপরি ভ্রমণকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের প্রবৃদ্ধি ও স্বার্থ বিবেচনায় রেখে পরিবেশ-ব্যবস্থাপনাকে সমুন্নত করাই উভয়ের লক্ষ্য।

ডায়াগ্রাম ৪ : ইকোট্যুরিজম ও ইকোপার্কের বৈশিষ্ট্য

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়: সমকালীন পরিবেশগত সংকট মানুষের জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে উন্নয়নের নীতি পর্যন্ত সকলকিছুকে পরিবেশসম্মত করে দেখার প্রবণতা তৈরী হয়েছে। এই প্রবণতাই বিনোদন ভ্রমণকেও পরিবেশসম্মত পন্থায় চিন্তা করার জন্য বিশ্ব জাতিগোষ্ঠীর সংগঠন ইউ.এন.ও'র অঙ্গ সংগঠনসমূহ ইকোট্যুরিজমের প্রস্তাব করছে। ইকোট্যুরিজমের বিকাশর সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনের জন্য সুনির্দিষ্ট স্থান যা পরিবেশ-প্রকৃতি পরিবেষ্টিত তাদেরকে বিনোদন স্থানের আওতায় আনা হচ্ছে। ভ্রমণ যেখানে পরিবেশ-প্রকৃতিকেন্দ্রিক স্বাভাবিক কারণে ভ্রমণের স্থানসমূহকে অনুরূপ হবার প্রয়োজন রয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই ইকোপার্ক ধারণার জন্ম।

২.২. রিজার্ভ ফরেস্ট ও ইকোপার্ক : নিরাপদ-বনজ এলাকা এবং রিজার্ভ ফরেস্ট সমকালীন পরিবেশবাদী ভাবনার আরেকটি দিক। বনজ-এলাকাসমূহকে কোনোপ্রকার বিনষ্ট না করে সংরক্ষণ করাই রিজার্ভ ফরেস্টের ধারণা। ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত Bangladesh Wildlife Preservation Act-1974' রিজার্ভ ফরেস্টের ধারণা প্রবর্তণ করে। আন্তর্জাতিক IUCN এর ঘোষণা মোতাবেক এই অ্যাক্টে তিন ধরনের বনজভূমিকে রিজার্ভ ফরেস্টের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়। তাদের বাসস্থান নিরাপদ রাখার জন্য 'বন্যপ্রাণী নিয়ন্ত্রণ' এলাকা' প্রয়োজন, উদ্ভিদ এবং প্রাণী বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য 'জাতীয় উদ্যান' এবং গেইম রিজার্ভ –এই তিনটিই রিজার্ভ ফরেস্টের অংশ। তন্মধ্যে জাতীয় উদ্যানসমূহই ইকোপার্ক বা বিনোদন পার্কের মর্যাদা লাভ করেছে।

৩. বাংলাদেশের ইকোপার্কের বিবরণ

এশিয়ার অনেক দেশ ট্যুরিজমে বৈচিত্র্য আনার জন্য তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ-বৈচিত্র্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ের গবেষণাকে আরো সংহত করার জন্য ইকোপার্ক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তবে এটাও সত্য বিশ্ব পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে পণ্যের পুরোনো তালিকায় কিছু সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে, এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি নিজেও সংযোজিত হয়েছে পণ্য হিসাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে ইকোপার্কের স্থান নির্ধারণে যে ভূগোল ও সংস্কৃতিকে নির্বাচন করা হচ্ছে তাতে দলন ও আধিপত্যের সহযোগী হিসাবে অবস্থান করছে। সারা পৃথিবীর ইকোপার্কসমূহের যদি একটি তালিকা তৈরি করা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রকৃতি-সংস্কৃতি বা অরণ্য-সংস্কৃতি নির্ভর জাতিগোষ্ঠীসমূহের অবদমনের যে চিত্র উপস্থাপিত হয় তা বলা বাহুল্য। বাংলাদেশও সেই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার ইকোট্যুরিজমের বিকাশ এবং জাতি-পরিবেশবিদ্যার (ethno-ecology) জ্ঞানকে আরো বর্ধিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইকোপার্ক উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। বাংলাদেশের ইকোপার্কসমূহের তালিকা নিচের সারণীতে লক্ষ করা যেতে পারে: ইকোপার্কের তালিকা:১. সীতাকুণ্ডু ইকোপার্ক (চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম), ২. মাধকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপাক (মৌলভীবাজার), ৩. মধুপুর ইকোপার্ক (মধুপুর, টাঙ্গাইল), ৩. মধুটিলা শালবন ইকোপার্ক (শেরপুর), ৪. চিম্বুক ইকোপার্ক (বান্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রাম), ৫. গজনী ইকোপার্ক (শেরপুর), ৬. বাঁশখালী ইকোপার্ক (কুতুবদিয়া), ৭. নারিকেল জিঞ্জিরা (সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম), ৮. আলুটিলা (খাগড়াছড়ি), ৯. মধুটিলা (শেরপুর), ১০. দুলাহাজরা সাফারি পার্ক (দুলাহাজরা, কক্সবাজার), ১১. গাজিপুর জাতীয় উদ্যান (গাজিপুর), ১২. কুয়াকাটা (পটুয়াখালী), ১৩. ধানসিড়ি (ঝালকাঠি)। নিচের বাংলাদেশের মানচিত্রে ইকোপার্কের অবস্থানসমূহকে নিদের্শ করা হলো :

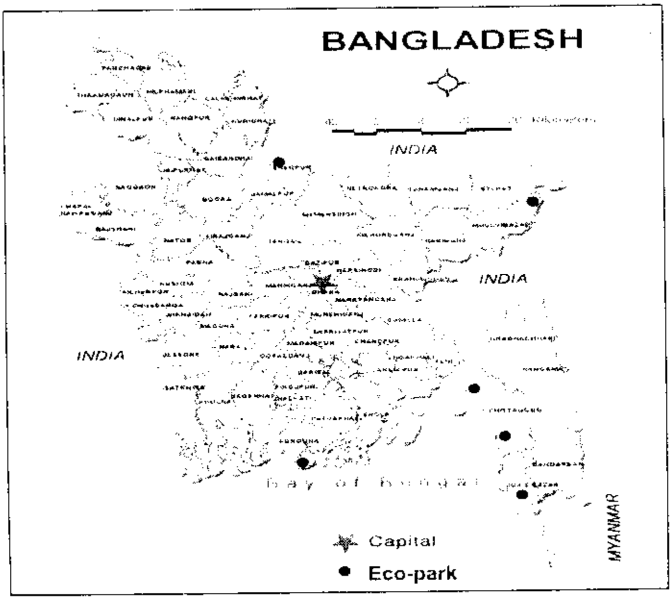

মানচিত্র ১: বাংলাদেশের ইকোপার্কসমূহের অবস্থান

৩.১ নিচে কয়েকটি ইকোপার্কের বর্ণনা দেওয়া হলো[৭]:

সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক: ১৯৯৯ সালে ইকোট্যুরিজমের বিকাশের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত ইকোপার্ক প্রকল্পের প্রথম অভিযাত্রা শুরু হয় চন্দ্রনাথ রিজার্ভ ফরেস্ট দিয়ে। প্রাণীবৈচিত্র্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেনকে সীতাকুণ্ড ইকোপার্কে রূপান্তরিত করা হয়। মুললক্ষ্য হিসাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়। নিচের সারণিটি লক্ষ করা যাক:

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক	১. ২০০১ সালে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তার কাজ শুরু হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে তা সম্পন্ন হয়। ২. প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় : ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যায় ধরা হলেও পরবর্তী সময়ে সংশোধনী বাজেটে এই ব্যায় ধরা হয় ৯.৯৮ কোটি টাকা।	চট্টগাম শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড় ও এর সুবিস্তৃত এলাকা নিয়ে উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়ি করে এই পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়।	আয়তন : সর্বমোট ১৯৯৬ একর ভুমির উপরে এই ইকোপার্কটির অবস্থান। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমান, হিন্দু এবং নিম্নবর্গের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর সদস্য রয়েছে।

সারণি ২ : সীতাকুণ্ড ইকোপার্কের বিবরণ

সীতাকুণ্ড ইকোপার্কে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে এর পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত বিভিন্ন মন্দিরের অবস্থিতি, 'সপ্তধারা' নামে প্রকৃতিক ঝরণা, বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, পশু-পাখি পার্কটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কিন্তু পার্কটির ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা, সরকারি বরাদ্দে জটিলতা ইত্যাদিসব কারণে পার্কটির কর্মিদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। এর সঙ্গে পার্কে দর্শনার্থিদের অবাধ বিচরণ, পরিবেশ-বিনষ্টকারী উপাদানসমূহের অনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি মিলিয়ে সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক তার আগের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে।। কিন্তু চন্দ্রনাথ পাহাড় ও তার পাদদেশে বাঁশ, বেত, ভেষজ উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির সমাহার ভিন্ন অঙ্গিক দিতে সক্ষম হয়েছে।

৩.২. মধুপুর ইকোপার্ক : মধুপুরের শালবন এলাকায় 'মধুপুর ইকোপার্কটি' গড়ে উঠেছে। ধারণা করা হয় আর্যসভ্যতা গড়ে উঠার পূর্ব থেকে বিশাল শালবনে মান্দি জনগোষ্ঠী স্বধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনধারা নিয়ে বসবাস করে আসছে। তাদের জীবনধারার সঙ্গে সেখানকার প্রাণী, উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সমমাত্রায় অভিযোজন করে আসছে। মধুপুর এলাকার গভীর অরণ্যে বসবাসরত এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস হাজার বছরেরও বেশি সময়ের। নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও মুধপুরের শালবন বিনষ্টের মধ্য দিয়ে সেখানে 'মধুপুর ইকোপার্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়।

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
মধুপুর ইকোপার্ক	১. ২০০০ সালে এডিবির অর্থায়নে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। ২. প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয় : ৯ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় এই বনটির অবস্থান। পূর্বে গাজিপুরের ভাওয়াল শালবনের সঙ্গে এর সংযোগ ছিলো।	আয়তন : মধুপুর গড়ের ৩০০০ একর এলাকা ঘিরে এই ইকোপার্কটির অবস্থান। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: এই এলাকার সংখ্যাঘরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আদিবাসী মান্দি জনগোষ্ঠী। একানে কচে-জনগোষ্ঠীরও বসবাস রয়েছে।

সারণি ৩ : মধুপুর ইকোপার্ক

মধুপুরের আদি-জনগোষ্ঠী মান্দিদের শালবন এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে প্রকৃতি-সংস্কৃতি উপর ভর করে নিরুপদ্রবভাবে বসবাস করে আসছিলো। প্রকৃতি-সংস্কৃতির মুলধারায় বসাবাসকারী এই জনগোষ্ঠী ১৮৬৫ সালে সাকসেশন আইনের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার মধুপুর পরগণাকে জমিদারের দায়িত্বে হস্তান্তর করেন। নাটোর জমিদার রাজা যুগিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সম্পূর্ণ বনাঞ্চলটি দেবতা গোবিন্দের নামে উৎসর্গ করেন। এসময়ে গারোরা তাদের বনজ-ভূমির উপর নামমাত্র খাজনায় পরিপূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার মধুপুর-বন এলাকাকে বনবিভাগের আওতায় আনা হয়, এতে করে বনজ-ভুমির উপর গারোদের কর্তৃত্ব লোপ পাবার ইতিহাস শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৫ সালে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, এবং ১৯৬২ সালে অস্থানীয় বাঙালিদের দ্বারা সে এলাকার বনভুমি বিনষ্ট হতে শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে এ এলাকা 'জাতীয় উদ্যান' হিসাবে ঘোষিত হবার মধ্য দিয়ে মুল-অধিবাসী গারোরা তাঁদের বনজ-সংস্কৃতি, বনের উপর তাদের অধিকার সব কিছু হারায়ে ফেলে। আদিবাসী গারোদের বন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরকারিভাবে শুরু হয়েছে বনজ-সম্পদের উপর দলন। সেখানকার ভূ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃক্ষাদি নিধন করে 'সামাজিক বনায়নের' নামে রাক্ষুসী এবং পরিবেশ-বৈরী উদ্ভিদ বপন করা হচ্ছে। এসবের মধ্য দিয়ে মধুপুর হারিয়ে ফেলছে তার অতীত প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্য।

ছায়াচিত্র ১: মধুপুর ইকোপার্কের জন্য নির্মাণাধীন সংস্কারকর্ম, (সূত্র : দি ডেইলি স্টার, ০২.০৩.২০০৭)

৩.৩. মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক : ২০০০ সালের ০৬ মার্চে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটে 'পরিবেশ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ' শিরোনামে একটি প্রকল্প অনুমোদন করেন। সরকার দাবি করছেন এই পরিকল্পনার মাধ্যমে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে, অন্যদিকে বিলুপ্ত-প্রায় প্রাণী, পাখি এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক	১.১৯৯৯ সালে প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০০১ সালের ১৫ এপ্রিল প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। ২. উক্ত প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয় ১১ কোটি টাকা।	মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানাধীন পাথারিয়া পাহাড়ের পশ্চিমে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এবং কুলাউড়া থানাধীন পৃথিমপাশা অ্যাকোর্ড ফরেস্টের লুথিটিলার পাদদেশ মুরাইছড়া জলপ্রপাত। এই দুটি এলাকা নিয়ে মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক।	আয়তন : মাধকুণ্ডের ৬৬৭ একর, এবং মুরাইছড়ার ৮৩৩ একর সর্বমোট ১৫০০ একর ভুমি ইকোপার্কের জন্য অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: মুরাইছড়ায় এবং মাধবকুণ্ড উভয় এলাকার সংখ্যাঘরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আদিবাসী খাসিয়া । মান্দি জনগোষ্ঠী ও রয়েছে।

সারণি ৪: মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্কের বিবরণ

মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক উন্নয়নের প্রভাব: জমি অধিগ্রহণের পাশাপাশি কিছু কিছু পাহাড় সমতল করার সিদ্ধান্ত ও এই পরিকল্পনারই অংশ হয়ে দাঁড়ায়। মোটর-যান চলাচলের জন্য রাস্তা সংস্কার এবং যাতায়ত উন্নয়নের ছুতোয় অসংখ্য বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ বিনষ্ট করা হয়। রজত কান্তি গোস্বামী[৮] আমাদেরকে জানান : ইকোপার্ক উন্নয়নের এই তৎপরতার ফলে দশটি খাসিয়া পঞ্জি (আদিবাসী গ্রাম), অন্য হিসাবে এক হাজার আদিবাসী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব পরিবারের সদস্যদের কোনোপ্রকার পুনর্বাসন না করেই তৎকালীন সরকার এই প্রকল্পটি হাতে নেয়। সেখানকার বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনোপ্রকার আলোচনা ছাড়াই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষ করে ঐ এলাকায় বসবাসরত খাসিয়া এবং গারো জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও অর্থনৈতিক উৎস হিসাবে যেসব উদ্ভিদ লতাপাতা ব্যবহৃত হয় তা নির্মূল করা হয়েছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নেতা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ধর্না দিয়ে আশ্বাস পেয়েছিলেন সে এলাকার আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। কিন্তু সে আলোচনার আর প্রয়োজন হয় নি। আলোচনা ছাড়াই মাধবকুণ্ড ঝর্ণা এবং সেখানকার গভীর আরণ্য নিয়ে পর্যটনকুঞ্জ, অন্যভাবে বলা হচ্ছে ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পনাহীন এই ইকোপার্ক এর মধ্য দিয়ে যেমন পরিবেশ-বৈচিত্র্য নষ্ট হয়েছে, সেই পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠা জনগোষ্ঠীও আবাসস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

৩.৪. বাশঁখালী ইকোপার্ক : ২০০৪ সালের দিকে বাঁশখালী উপজেলার জলদা বনবিটের আওতাধীন 'রামের ছড়া এবং ডানের ছড়া' এ দুটি এলাকা নিয়ে 'বাঁশখালী ইকোপার্ক' গড়ে তোলার উদ্যোগ বন বিভাগ গ্রহণ করে।

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
বাশঁখালী ইকোপার্ক	**প্রথম পদক্ষেপ:** এর আগে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় ৭৭৬৪ হেক্টর বনভূমিকে চুনতি অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সবুজ বনভূমি, অরণ্য-পরিবেষ্টিত ভু-প্রকৃতি ও পাহাড় নিয়ে আসা হয় এর আওতায়। 'ইফাদ' এর আর্থিক সহায়তায় বাঁশখালী ইকোপার্কের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৯৩ সালের দিকে। ১৯৯৯ সালে বাঁশখালী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডানের ছড়ায় আরেকটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। **দ্বিতীয় পদক্ষেপ: ২০০৪ সালে** এর উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।	ইকোপার্কটির বাশঁখালী উপজেলা৷ বামের ছড়া এবং ডানের ছড়ার সমন্বয়ে গঠিত। বামের ছড়ায় : জলদি, শীলকু এবং চাম্বল এলাকার সঙ্গে বাঁধ-নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে একত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে ফলে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। ২০০০ সালের দিকে ডানের ছড়া এবং বামের ছড়ার মধ্যবৃর্তি পাহাড় কেটে হ্রদ দুটিকে একত্রিত করা হয়। এই দুটি এলাকায় নিয়েই বাঁশখালী ইকোপার্ক।	আয়তন : বামের ছড়ার ২০ হেক্টও এবং ডানের ছড়ার এলাকর ৬০ হেক্টর মোট ৮০ হেক্টর এলাকায় নিয়ে বাঁশখালী ইকোপার্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: সাধারণ মৎস্যজীবী মানুষ।

সারণি ৫ : বাঁশখালী ইকোপার্কের বিবরণ

গভীর অরণ্য বিচিত্র পশুপাখি, উঁচু-নিচু টিলা এসব মিলিয়ে বাশখালী ইকোপার্কের ভূ-বৈচিত্র্য মনোরম ।

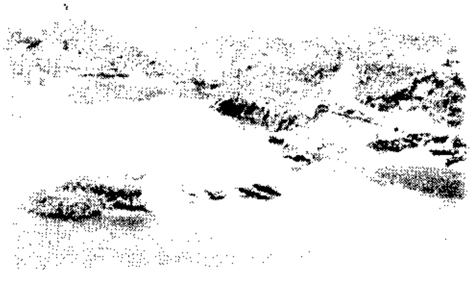

ছায়াচিত্র ২: বাঁশখালী ইকোপার্ক

৩.৫ চিম্বুক ইকোপার্ক : বান্দরবানের চিম্বুক পার্বত্য এলাকায় এ ইকোপার্কটি গড়ে উঠেছে। ইকোপার্কটি প্রতিষ্ঠার সময় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। চিম্বুক ইকোপার্ক সম্পর্কিত তথ্য নিচের সারণিতে দেয়া হলো:

	প্রতিষ্ঠাকাল ও অর্থায়ন	ভৌগোলিক অবস্থান	আয়তন ও বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
চিম্বুক ইকোপার্ক	**প্রথম পদক্ষেপ**: ২০০৪ সালের ৫ ডিসেম্বর চিম্বুক হিল রেঞ্জকে ইকোপার্ক হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদের ফলে ইকোপার্কটি নির্মাণের ক্ষেত্রে চতুরতার আশ্রয় নেয়।	বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার এবং সদর-রুমা উপজেলার মাঝামাঝি এলাকার চিম্বুক হিলে গড়ে তোলা হয় এই ইকোপার্কটি।	আয়তন : রিজার্ভ বনাঞ্চলের ছয় একর জুড়ে অভয়ারণ্য গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করা হয়।। বসবাসকারী জনগোষ্ঠী: ম্রো, মারমা, ত্রিপুরা এবং তঞ্চংগ্যা

সারণি ৬ : চিম্বুক ইকোপার্ক

চিম্বুক ইকোপার্কটি ভ্রমণ-পিপাসু মানুষের জন্য মানসিক বিনোদনের জন্য নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ইকোপার্ক নীতিমালার আওতায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

ছায়াচিত্র ৩: চিম্বুক ইকোপার্কে উদ্ভিদ-প্রাণী বৈচিত্র্য সমন্বয় (সূত্র : The Daily Star.net/2003/11/21.)

উপর্যুক্ত ইকোপার্ক ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি স্থানকে ইকোপার্কের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তন্মধ্যে শেরপুরের গজনীতে শালবন ঘেরা ঘন-অরণ্য ভূমিকে ইকোপার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এই ইকোপার্কটিতে বিনোদনের নামে কৃত্রিম লেক তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্রগ্রামের বেশ কয়েকটি এলাকা যেমন, খাগড়াছড়ির মহালছড়ি, চিম্বুক হিল রেঞ্জ, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের বিভিন্ন এলাকায় ইকোপার্ক নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু সে এলাকার জনগণের প্রতিবাদের মুখে শেষতক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইকোপার্ক উন্নয়নের পেছনের দর্শন হিসেবে যদিও বলা হয় জীববৈচিত্র্য রক্ষা, অভয়ারণ্য সৃষ্টি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় আদিবাসী আবার কোথাও-বা নিম্নবর্গের বাঙালি জাতিগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আর ইকোপার্কের সঙ্গে ইকোট্যুরিজমের ধারণা সম্পৃক্ত হবার ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর চালচিত্র আরো সঙ্কটাপন্ন। আমাদের বাস্তবতায় ইকোপার্ক গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক কোনো বিধি অনুসরণ

করা হয় না। এমনকি এসইএ এবং ইআইএ সংশ্লিষ্ট যে বিধি রয়েছে তার কোনো মানদণ্ড এখানে অনুসরণ করা হয় না। চতুর্থ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস নেব।

৪.১ বাংলাদেশের ইকোপার্ক : প্রতিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিত

পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের রয়েছে মেলবন্ধন। কিন্তু বিজ্ঞান ও উন্নয়ন ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যে পরিবেশ-ধ্বংসযজ্ঞ হচ্ছে তা এই মেলবন্ধনে ছেদ ঘটাচ্ছে। এই ছেদের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পরিবেশ-সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। এই ভাবনার মধ্যে আমরা যখন দেখতে পাই আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক অপতৎপরতা, ব্যবসায়িক মনোবাঞ্ছা, কিংবা বিশেষ কোনো জাতিগোষ্ঠীর উপর দলন পরিচালনের মতলব তখনই পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে রাষ্ট্রের বা কর্পোরেট-দালালদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে গৃহীত 'ইকোপার্ক প্রজেক্ট কর্মসূচিতে' আমরা সেরকমটিই লক্ষ করছি।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতারও অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকে সমতল এবং পাহাড় ভিন্ন জীবন-বৈচিত্র্যের ধারকবাহক হিসেবেও রয়েছে। পাহাড়ের অধিবাসীরা হয় উপজাতি (?) নতুবা আদিবাসী হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। নামকরণের দিক থেকে দাপুটে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ক্ষুদ্র-জনগোষ্ঠী অসহায় এটাই স্বাভাবিক। এখানেই গ্রামসীয় 'হেজেমনি'র চূড়ান্ত দৃশ্যমানতা। একদিকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবোধ, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ ভক্তি ও সংরক্ষণবাদী মনোবৃত্তি, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী রক্ষাযন্ত্র 'রাষ্ট্রের' আধিপত্যবাদী স্বরূপ-এই দুই সমসাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক উপাদানের উৎপাতে প্রান্তিক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সত্তা ভূলুণ্ঠিত। তাহলে 'ভূলুণ্ঠিত সাংস্কৃতিক সত্তা' এবং 'আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক বলয়' স্বরূপের দিক থেকে আলাদা, মাত্রার দিক থেকে উঁচু-নিচু, সম্পর্কের দিক থেকে আধিপত্যবাদী। এসব অনুঘটনার মধ্যে আমরা পাই সেই দার্শনিক দ্বৈতবাদী চরিত্রের উপস্থিতি। এই দ্বৈতবাদী চরিত্রের প্রকাশিত রূপই হলো উন্নয়ন। যেমন উন্নয়নের নামে প্রথম পদক্ষেপে আমরা লক্ষ করি : পাহাড়ি এলাকায় বাঙালি সেটেলার (বসবাসকারী) প্রেরণ এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। দ্বিতীয় পদক্ষেপে আমর লক্ষ করি : পাহাড়ি এবং বনজ-সংস্কৃতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর (গারো, সাঁওতাল ইত্যাদি) ভোগ-দখলকৃত প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় অধিকার বাস্তবায়নের প্রয়াস। এই দুটি পদক্ষেপেই আমরা লক্ষ করছি দ্বৈতবাদী চরিত্রের অনুশীলন। এই অনুশীলনের নির্মম দৃষ্টান্ত হলো 'ইউএসএইডের অর্থায়নে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ'*। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ইকোপার্ক প্রকল্পের নামে বস্তুতপক্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠী উচ্ছেদ প্রকল্প চলছে। কাপ্তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের দোহাই ছিল। অথচ এই দোহাইয়ের মধ্য দিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি নৃ-জাতিগোষ্ঠীর বিশাল অংশ। রাজা দেবাশীষ রায় থেকে উদ্বৃতি দেয়া যাক-পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য এটা ছিল মানবসৃষ্ট এক মহাবিপর্যয়ের ঘটনা। এর ফলে প্রায় ১ লক্ষ স্থানীয় অধিবাসী, যাদের অধিকাংশই ছিল চাকমা, উদ্বাস্তু হয়েছে।[১০]

ইতোমধ্যে সরকার ইকোট্যুরিজমের বিকাশ ও এ খাত থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে ইকোপার্ক স্থাপনের বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মাধবকুণ্ড-মুরইছড়া, মধুপুর ও

চিম্বুক ইকোপার্ক প্রকল্প তন্মধ্যে কয়েকটি। এই প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে একদিকে যেমন আদিবাসী বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অন্যদিকে আদিবাসী সংস্কৃতি ও জীবনবোধের নানা ধারা-উপধারাসমূহকে বিলুপ্ত করার কাজও চলছে। উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসী এবং তাদের ভূমিকে বেছে নেবার পশ্চাতে দ্বৈতবাদী অপদর্শনটি কাজ করেছে। উন্নয়নের অধিক্ষেত্র হিসেবে প্রান্তিক ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠীসমূহকে বেছে নেবার ক্ষেত্রে এই দ্বৈতবাদ মনস্তাত্ত্বিক রসদ সরবরাহ করেছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'আয়-ব্যয় হিসাবের' চেয়ে দ্বৈতবাদ কম যায় না। 'আয়-ব্যয় হিসাবের' মাধ্যমে যেমন পলিসি বা সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়, তেমনি প্লান্ট বা ক্ষেত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদ সাহায্য করে। উন্নয়নের এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশেও 'প্রতিবেশ-নারীবাদের' একটি পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে। 'প্রতিবেশবাদের' লক্ষ্যের দিক থেকে শুধু 'নারী ও প্রতিবেশের' ওপর মানব প্রতিহিংসার চালচিত্রই তুলে ধরে না। বরং আধিপত্যবাদী, শোষণবাদী, লিঙ্গবাদী এবং বর্ণবাদী চরিত্র উন্মোচনের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি একটি 'কৌশল' হিসেবেও কাজ করে। দুর্বল এবং সবল এই দ্বি-সত্তাকে বোঝার মধ্য দিয়ে সামাজিক শোষণ ত্বরান্বিত হয়। শোষণের এই মাত্রায় শুধু যে শ্রেণি-শোষণ কার্যকর হয় তা-ই নয়, বরং শ্রেণি-শোষণের পাশাপাশি লিঙ্গগত শোষণের বিষয়টিও রয়েছে। শোষণের আরেকটি কসমোপলিটান চরিত্র হলো 'প্রযুক্তি' তথা 'বিজ্ঞান'। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এই দুইয়ের ওপর ভর করেই হয় উন্নয়ন। আর জাতি হিসেবে তাদেরকেই উন্নত বিবেচনা করা হয়, যারা বেশিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদকে করায়ত্তে আনতে পেরেছে। প্রাকৃতিক সম্পদকে করায়ত্তে আনার মধ্য দিয়ে বস্তুত পরিবেশ-প্রকৃতির বিনাশকেই উদ্বোধন করা হয়। তাহলে আধিপত্যের লক্ষ্য হলো শোষণ, শোষণের ক্ষেত্র হলো 'সমাজ, শ্রেণি, নারী ও পরিবেশ-প্রকৃতি'। প্রতিবেশ-নারীবাদ শোষণের এই বহুমাত্রিক প্রকাশগুলোর চরিত্র উন্মোচন করার দর্শনও বটে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য 'ইকোপার্ক উন্নয়নের' প্রকল্পটি প্রতিবেশবাদী গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বিনষ্ট করা হচ্ছে সে এলাকার ভেষজ উদ্ভিদসমূহ। এই উদ্ভিদ বিনাশের কারণে ধ্বংস হচ্ছে সেখানকার প্রাণবৈচিত্র্য। বিখ্যাত পরিবেশতাত্ত্বিক বেরি কমোনারের পরিবেশ বিষয়ক নীতির প্রথম নীতিটির কথা এ প্রসঙ্গে উলে-খ করা যেতে পারে, 'সবকিছুই অন্যকিছুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পৃক্ত'। পরিবেশ বিষয়ক এই নীতিটি মূলত মধুপুরের শালবনের আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। একজন গবেষকের লেখা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'মধুপুর শালবনের অধিকাংশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা হয়েছে। কলা, আনারস ও বিদেশি বা আগ্রাসী প্রজাতির দৌরাত্ম্য পুরো এলাকা জুড়ে। তারপরও যেটুকু জায়গায় এখনো এসবের আগ্রাসন হয় নি সেখানে শালবনের শত শত প্রজাতি কীভাবে বাঁচার চেষ্টা করছে এ জায়গাটি তারই উদাহরণ।'[১১] একজন জাতি-উদ্ভিদ গবেষকের সূত্র থেকে গাইন উল্লেখ করছেন, "এখনো যেখানে শাল কপিস আছে, কেবল সেখানেই উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্র্য আছে। যেসব জায়গায় কলা, আনারস ও আগ্রাসী প্রজাতির বাগান হয়েছে সেখানে প্রাণবৈচিত্র্য একেবারে নেই"।[১২]

আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে বেড়ে ওঠে উদ্ভিদ এবং এসব উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'প্রাণবৈচিত্র্য'। কিন্তু উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের বন-আগ্রাসন নীতি একদিকে আমাদের প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যকে যেমন ধ্বংস করছে, অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যের মধ্যে

বসবাসকারী নৃ-জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নির্মাণসমূহ অবলুপ্ত হচ্ছে। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। ইকোপার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। ইকোপার্ক প্রকল্প নারীবাদী ইস্যুও। মধুপুরসহ সারাদেশের ইকোপার্ক প্রকল্পের আওতায় পরিবেশ ধ্বংসের বিশাল আয়োজন যেমন সম্পন্ন হচ্ছে, তেমনি বনবাসী সহজ-সরল নারীর ধর্ষিত হবার ঘটনার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়ন প্রচেষ্টাটি একাধারে প্রতিবেশবাদী ইস্যু। ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দুটি নগ্ন তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে : এক আদিবাসীর বনজ-ভুমিকে জবরদখল করার মাধ্যমে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা, দুই. ভু-প্রকৃতি ও বনজ-প্রকৃতিকে ধ্বংস করা। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বিনষ্ট করা হচ্ছে সে এলাকার ভেষজ উদ্ভিদসমূহ। উদ্ভিদ বিনাশের কারণে ধ্বংস হচ্ছে সেখানকার প্রাণবৈচিত্র্য। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। ইকোপার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। আর এভাবে ইকোপার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি পরিবেশবাদী ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ পর্যন্ত যে ইকোপার্কসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তন্মধ্যে মধুপুর ইকোপার্ক, মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক এবং চিম্বুক ইকোপার্ক গুরুত্বপূর্ণ। মধুপুর বিস্তীতৃর্ণ বনভূমির ৭০ ভাগই শাল। শাল ঐ এলাকার ভূ-বৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং মুধুপুর কিংবা তদসংলগ্ন এলাকার মাটি শালবৃক্ষের জন্য উপযোগী। শালের পাতা পচে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। উর্বর ভূমিতে আবার গজিয়ে উঠে শালকপিস। শালবনে শালের সঙ্গে বেড়ে উঠে চম্বল, সিধা, আমলকি, সাজনা, কালস, কড়ই, গাওগিলা এবং আজুলি বৃক্ষ। ১৯৫০ সালে 'The State Acquisition and Tenancy Act of 1950' এর মাধ্যমে ময়মসিংহ এবং সিলেট এলাকার বিশাল বনজ এলাকাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অ্যাক্টের মাধ্যমে এই নিয়ন্ত্রণ আরো পাকাপোক্ত হয়ে উঠে। এভাবেই অ-পরিবেশবাদী বননীতি সমকালীন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লোকায়ত পরিবেশ অবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছে।

৪.২ ইকোপার্ক উন্নয়ন ও SEA এবং EIA

সমকালীন পরিবেশবাদী তত্ত্বের বিকাশের ফলে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিবেশ সম্মত কি-না তি নির্ধারণের জন্য বেশ কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করা হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

ক. এসইএ (Strategic Environmental Assessment)

খ. ইআইএ (Environmental Impact Assessment)

সিইএ এবং ইআইএ উভয়ের লক্ষ্য পরিবেশ, অর্থনীতি, সামাজিক ইস্যু এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। ইআইএ (EIA) এর জন্য এসইএ (SEA) খুবই জরুরী। নিচের ডায়াগ্রামে তা দেখানো হলো:

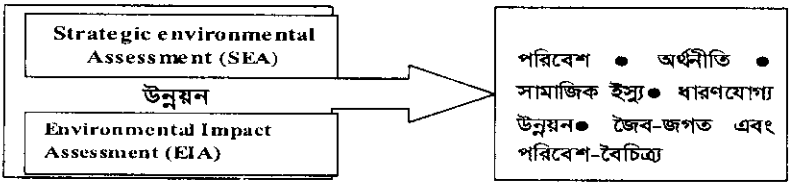

ডায়াগ্রাম ৫ : SEA ও EIA এর লক্ষ্য

SEA এবং EIA উভয়ের মধ্যে সাধারণ কতগুলো শর্ত রয়েছে যা কোনো পলিসি বা প্ল্যান গ্রহণের সময় বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দুটি কৌশলকে গৌণ করে দেখা হয়েছে। SEA এবং EIA এর লক্ষ্য যেখানে উন্নয়ন পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিকসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া সেক্ষেত্রে কোনোটিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। উপর্যুক্ত দুটি কৌশল ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব ইকোপার্ক উন্নয়ন কিভাবে পরিবেশগত বাস্তবতাকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছে।

৪.৩. বাংলাদেশের ইকোপার্ক উন্নয়ন : এসইএ (Strategic environmental Assesment) মূল্যায়ন

বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা ইতোমধ্যে সফলতা অর্জন করেছে। মধুপুর ইকোপার্ক, চিম্বুক ইকোপার্ক এবং মাধবকুণ্ড-মুরাইছড়া ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সরকারের সফলতার পাল্লা বাড়লেও সেখানকার পরিবেশ বিপর্যয় গবেষকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। সেখানকার পরিবেশ বিপর্যয়ের স্বরূপটি দেখার পূর্বে আমরা জেনে নেব 'এসইএ' কী? কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিবেশের জন্য কতোটুকু ক্ষতিকর, কিংবা কোন ফ্যাক্টরসমূহের উপস্থিতি পরিবেশ-বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে তা বিবেচনায় রেখে নীতিনির্ধারণে কৌশল প্রণয়ন করাই 'এসইএ' এর ভূমিকা। 'এসইএ' গৃহীত ইফেক্টিভ নীতিমালাসমূহ লক্ষ করা যাক:

১. যে কোনো প্রস্তাবিত পলিসি বা নীতির বা পরিকল্পনা বা পোগ্রামের পরিবেশগত প্রভাব কী তা বিবেচনায় রাখতে হবে।
২. যে কোনো উন্নয়নের সময় নীতিনির্ধারকদের 'এসইএ' এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
৩. 'এসইএ' কে অবশ্যই নীতিনির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে হবে।
৪. 'এসইএ' পরিবেশগত প্রভাবসমূহ নির্ণয়ে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রয়োগযোগ্য পরিবেশ নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।
৫. পলিসি বা প্লানের যৌক্তিকতা কিংবা এর গঠন-কাঠামো কি রকম হবে তা অবশ্যই প্রক্রিয়ামফিক হতে হবে।
৬. যে গোষ্ঠীকে লক্ষ রেখে উন্নয়ন করা হয় সে গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে যেন গৃহীত পলিসি যুৎসই হয়।

৭. আমাদেরকে অবশ্যই আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ কৌশলটি অনুসরণ করতে হবে, এতে করে গৃহীত পলিসিটি একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হবে।

৮. সিদান্ত-প্রণয়নকারীগণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত প্রভাবসমূহ যাচাই করে দেখবেন।

সর্বোপরি 'এসইএ' থেকে যে সুফলসমূহ আমরা পেতে পারি তা নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো যেতে পারে :

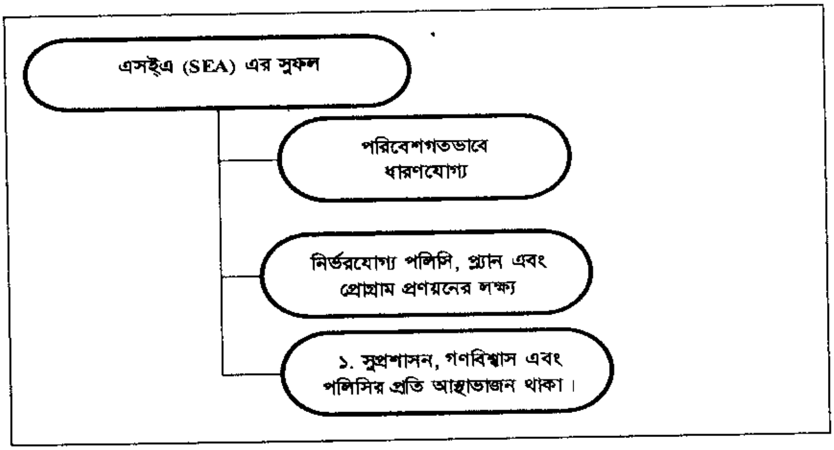

ডায়াগ্রাম ৬ : এসইএ (SEA) এর লক্ষ্য

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকোপার্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে ভিন্ন প্রতিচিত্র। মধুপুর ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবাহিনী এবং ইকোপার্ক উন্নয়নের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহ প্রতিশ্রুত দুটি শর্তকেই পাশকেটে গিয়েছে।

৪.৩.(ক). মধুপুর ইকোপার্ক : ১৭ জুলাই ২০০০ সালে উডলটে অংশগ্রহণকারী ১৬৪ জনের স্বাক্ষরিত তৎকালীন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে লেখা আবেদন পত্রটির[১৩] সারমর্ম বিশ্লেষণ করলেই মধুপুর ইকোপার্কের SEA এবং EIA লঙ্ঘনের চিত্রটি পাওয়া যাবে:

- আবেদনকারীগণ উল্লেখ করছেন মধুপুর বন উন্নয়নের নামে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে যে 'সামাজিক বনায়নের' পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাতে বন এলাকার গারো, কোচ এবং বাঙালিদের অনেকেরই অংশীদার হবার কথা। বনবিভাগের সঙ্গে চুক্তি হবার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাদেরকে উডলটে অংশীদার করা হয়েছে তারা বাগান রক্ষা করবে, সাত বছর পর গাছ বিক্রি করে যে আয় হবে তার ৪০ শতাংশ তারা পাবে। প্রকল্প শুরু করার সময় বনবিভাগ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই চুক্তি হলেও পরবর্তী সময় তাদেরকে বনের অংশীদারিত্বের প্রশ্নে কোনো সুযোগ দেওয়া হয় নি। যা আন্তর্জাতিক সামাজিক বনায়ন এবং ইকোপার্ক উন্নয়ন নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

- বনায়নের শর্ত হিসাবে চুক্তিতে শালকপিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও শেষতক দেখা যায় রাক্ষুসী-প্রজাতির উদ্ভিদ ইউক্যালিপটাস, আকাশিয়া, কলা, আনারস-এরকম উদ্ভিদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব উদ্ভিদ দ্রুত-বর্ধনশীল হলেও পরিবেশের জন্য, সে এলাকার ভু-বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর।
- বনের উপর থেকে সে এলাকার মানুষের নিয়ন্ত্রণ কমে যাবার ফলে অবাধে সেখানে বৃক্ষ-নিধন হচ্ছে, পুলিশ এবং কাঠব্যবসায়ীদের যোগসাজশে কাঠ চুরি ও লুটপাট হচ্ছে। আর এসবের সঙ্গে বনবিভাগের অসাধু কর্মচারী এবং কর্মকর্তারা নিজেদের আড়াল করার জন্য স্থানীয়দের হয়রানির করার জন্য মিথ্যা-মামলা দিয়ে হয়রানি করছে।

উপর্যুক্ত আবেদনে যে বিষয়সমূহ গুরুত্ব পেয়েছে তার সব কয়টিই SEA এবং EIA এর নীতিসমূহের লঙ্ঘন বলা যায়। কারণ এ দুটি কৌশলই দাবি করে : পলিসি গ্রহণের সময় অংশীদারদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। স্থানীয় জনগোষ্ঠী সুবিধার দিকটিকে বিবেচনায় রাখা। আর পরিবেশ-বান্ধব ভূমিকাকে অবশ্যই গুরুত্ব দেবার কথা বলা হয়। কিন্তু উপর্যুক্ত আবেদনের বক্তব্য তেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি মধুপুর ইকোপার্ক কিংবা সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে SEA এবং EIA এর শর্তসমূহ অনুসরণ করা হয় নি।

৪.৩.(খ). মৌলভীবাজার ইকোপার্ক : মৌলভীবাজারে ইকোপার্ক করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সে এলাকার খাসিয়া এবং গারো জনগোষ্ঠী ব্যাপক প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদের কারণ দুটি : স্বীয় আবাসভূমি থেকে বিতারিত না হবার এবং ভূমি, বন এবং প্রকৃতির উপর তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করার। কিন্তু মৌলভীবাজার মাধবকুণ্ডু-মুরাইছড়া ইকোপার্কের বিরুদ্ধে সে এলাকার আদিবাসীদের আন্দোলন সংগ্রাম প্রমাণ করে পলিসি গ্রহণকারী আধিকারিকগণ স্থানীয় জনগণের ন্যায্য দাবিকে মোটেই আমল দেয় নি। এখানে আমরা স্পষ্টত SEA এবং EIA -এর শর্তসমূহের ব্যত্যয় লক্ষ করি।

তাছাড়াও আমরা লক্ষ করে দেখব ২০০০ সালের জাতিসংঘের পর্যটন কমিশনের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত, ইউএনইপি'র ট্যুরিজম গাইড এবং কানাডার কুইবেকেব ঘোষণার পরিপন্থি। ১৯-২০ মে ২০০২ সালে কানাডার কুইবেকে অনুষ্ঠিত সামিটে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ-সবমিলিয়ে আমাদের ইকোপার্কে এসব ঘোষণার কোনোটিই অনুসরণ করা হয় না। নিচের সারণিটি লক্ষ্য করা যাক :

বাংলাদেশ ইকোপার্ক	ইউএনইপি ঘোষণা	মন্তব্য
	নীতি-ক : যেকোনো পরিকল্পনায় বা নীতি গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে সক্রিয় থাকা।	বাংলাদেশের অধিকাংশ ইকোপার্কসমূহ নীতি-ক এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয় নি। আমরা লক্ষ করে দেখব অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্র কিংবা ইকোপার্কসমূহের অবস্থান আতিবাসী অধ্যুসিত এলাকায়, কিন্তু আদিবাসীদের যে প্রাকৃতিক চিন্তা-চেতনা রয়েছে, তাদের প্রকৃতিবাদী জীবনাচারের সঙ্গে যে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বোধ-উপলব্ধি বিদ্যমান তার কোনোটিকেই এসব উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। পাহাড়ি আবিসীদের জীবন-সংস্কৃতির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তাদের 'জুম - কৃষি সংস্কৃতি'। কোনো প্রকার নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই পাহাড় কাটা, বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস করা – সবই হচ্ছে ইকোপার্কের নামে কোথাও - বা সামাজিক-সংস্কৃতির নামে।

সারণি ৭: ইউএনইপি নীতি-ক ও বাংলাদেশ ইকোপার্ক

বাংলাদেশ ইকোপার্ক	ইউএনইপি ঘোষণা	মন্তব্য
	নীতি-খ : পর্যটন উন্নয়নে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্মতি বা অসম্মতির অধিকার	মধুপুর, মৌলভীবাজর, চিম্বুক এলাকায় স্থানীয় এলকাবাসীর ইকোপার্কেও বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম গড়ে তোলা। ইকোপার্কসমূহ প্রতিষ্ঠার সময় স্থানীয় লোকজনের ভুমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ইকোপার্ক বিরোধী আন্দোলনে সংখ্যাধিক এলাকাবাসীর হত্যাকাণ্ড সেই এলাকার জনগণের সম্মতি দেবার বিষয়টিকে যে গ্রাহ্য করা হয় নি সেটাই তার প্রমাণ।

সারণি ৭ : ইউএনইপি নীতি-খ ও বাংলাদেশ ইকোপার্ক

বাংলাদেশ ইকোপার্ক	ইউএনইপি ঘোষণা	মন্তব্য
	নীতি-গ : স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভুমি, এলাকার মধ্যে পর্যটন-শিল্প বা ইকোপার্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ, সক্রিয় ভুমিকা নিশ্চিত করতে হবে।	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের নামে গড়ে উঠা ইকোপার্কসমূহ কিংবা কোনো পর্যটন কেন্দ্রে সে এলাকার স্থানীয় লোকদের কোনো ভুমিকা নেই।

সারণি ৮ : ইউএনপি ঘোষণা

উপর্যুক্ত তিনটি সারণিই দেখাচ্ছে পর্যটন শিল্পের নামে, কিংবা গবেষণা ও প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যের নামে গড়ে উঠা ইকোপার্কসমূহ কোনোটাতেই আন্তর্জাতিক বিধি বা রীতি ন্যূনতম অনুসরণ করা হচ্ছে না।

৫.০ উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশে ইকোপার্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দুটি নেতিবাচক তৎপরতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে : এক আদিবাসীর বনজ-ভুমিকে জবরদখল করার মাধ্যমে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা। দুই. ভু-প্রকৃতি ও বনজ-প্রকৃতিকে ধ্বংস করা। এই উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম বিনষ্ট করা হচ্ছে সে এলাকার ভেষজ উদ্ভিদসমূহ। উদ্ভিদ বিনাশের কারণে ধ্বংস হচ্ছে সেখানকার প্রাণবৈচিত্র্য। একজন গবেষকের লেখা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'মধুপুর শালবনের অধিকাংশ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা হয়েছে। কলা, আনারস ও বিদেশি বা আগ্রাসী প্রজাতির দৌরাত্ম্য পুরো এলাকা জুড়ে। তারপরও যেটুকু জায়গায় এখনো এসবের আগ্রাসন হয় নি সেখানে শালবনের শত শত প্রজাতি কিভাবে বাঁচার চেষ্টা করছে এ জায়গাটি তারই উদাহরণ।' একজন জাতি-উদ্ভিদ গবেষকের সূত্র থেকে ফিলিপ গাইন উল্লেখ করছেন, 'এখনো যেখানে শাল কপিস আছে, কেবল সেখানেই উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্র্য আছে। যেসব জায়গায় কলা, আনারস ও আগ্রাসী প্রজাতির বাগান হয়েছে সেখানে প্রাণবৈচিত্র্য একেবারে নেই'। আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেয়ে বেড়ে ওঠে উদ্ভিদ এবং এসব উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'প্রাণবৈচিত্র্য'। কিন্তু উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের বন-আগ্রাসন নীতি একদিকে আদিবাসী এলাকার প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করছে,

অন্যদিকে এই প্রাকৃতিক-বৈচিত্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নৃ-জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নির্মাণসমূহ অবলুপ্ত হচ্ছে। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অরণ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। ইকোপার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। আর এভাবে ইকোপার্ক উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি পরিবেশবাদী ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম বাস্তবতায় ইকোপার্ক উন্নয়নে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন, অন্যদিকে স্থানীয় জ্ঞানিক মাত্রাকে ইকোপার্ক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমাদের পরামর্শ হলো: ১. ইকোপার্ক উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ঐ জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশিদারীত্ব নিশ্চিত করা। ২. SEA এবং EIA -এর শর্তসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন, ৩. এসব শর্তসমূহের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কাঠামো অনুসারে ইকোপার্ক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করলে তা পরিবেশবাদী দাবির পাশপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে।

ইকোপার্ক ও ইকোট্যুরিজমের এই সম্পর্ককে আমরা এভাবে দেখতে পারি।

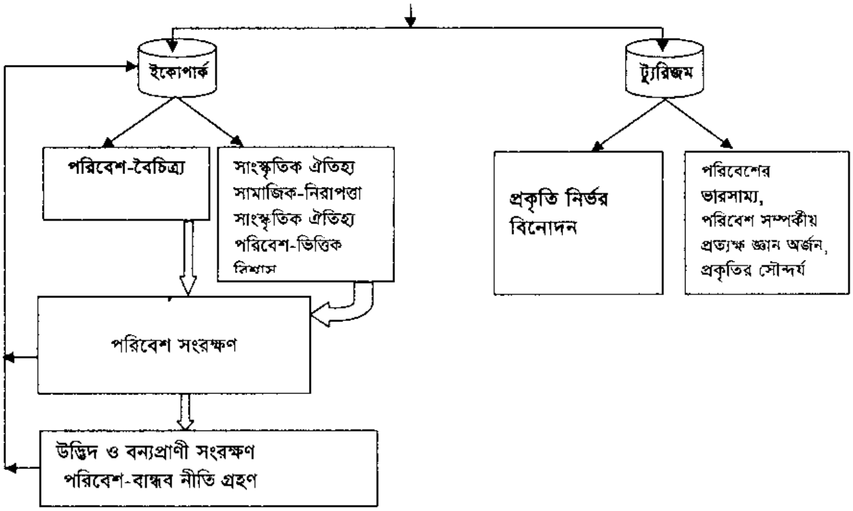

ডায়াগ্রাম ৭ : ইকোপার্কের প্রকৃতি

তথ্যসূত্র

১. Report on "Sustainable Tourism", The Berlin Declaration on Biological Diversity and Sustainable Tourism", International Conference of Environment Ministers on Biodiversity and Tourism 6-8 March, 1997. Berlin, German.

২. 2. Ibid. 1997, Berlin, German.

৩. Przeclawski, K. Deontology of tourism. In C. Cooper and S. Wanhill (eds) Tourism Development: Environmental and Community Issues , 1997, pp. 105.

৪. Budowski, T. Ecotourism Costa Rican style. In V. Barzetti and Y. Rovinski (eds) Toward a Green Central America: Integrating Conservation and Development. Panos Institute, 1992.

৫. Przeclawski, K. op.cit., 1997, pp. 105.

৬. Nelson, J.G. The spread of ecotourism: Some planning implications. Environmental Conservation 21 (3), 1994, 248-255.

৭. ইকোপার্ক সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত তথ্যাদি দেখুন, মেহদী, মুজিব, ইকোপার্ক উন্নয়ন : জীববৈচিত্র্য বার নামে জীবন ও প্রতিবেশ বিনাশী তাণ্ডব, ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট, ২০০৫.

৮. Rajat Kanti Goswami, Foundation of "controversial", Eco-park to be laid today, The Daily Star, Dated, 14-04-2001.

৯. মেহদী, মুজিব "স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাপন ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ইকোপার্কের তিকর প্রভাব" ইকোপার্ক উন্নয়ন : জীববৈচিত্র্য রার নামে জীবন ও প্রতিবেশ বিনাশী তাণ্ডব, আইইডি ও এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ, ঢাকা ২০০৫ ।

১০. মেহদী, মুজিব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৮ । গবেষক উদ্ধৃতি নিয়েছেন খান, হাফিজ রশিদ সম্পাদিত বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী : অংশীদারিত্বের নতুন দিগন্ত নামক প্রকাশনায় মুদ্রিত রাজা দেবাশীষ রায়ের প্রবন্ধ 'পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার স্বরূপ' থেকে, অক্টোবর ১৯৯৩ ।

১১. গাইন, ফিলিপ, বাংলাদেশের বিপন্ন বন, সেড, লালমাটিয়া, ঢাকা, ২০০৫, পৃ.৯ ।

১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৩ ।

১৩. গাইন, ফিলিপ (সম্পাদিত), বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম, সেড, লালমাটিয়া, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৫৩.